“গীতারত্ন” শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৫ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রিত সংখ্যা : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জাল সংখ্যা : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬২তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২/ 24.05.2025

:- সম্পাদক -:

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৬২তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
জীবন বিজ্ঞান	শ্রীমা
তেজস্বিতা ও শ্রীচৈতন্যের জীবন-বাণী	ডাঃ রুহিদাস সাহা
‘হিন্দুদর্শন’	শ্রীমতী মাধবী ঘোষ
গেঁওখালি ভ্রমণ কথা	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য
কেমনে যাবে গণ্ডির পারে	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালবীয়া
বৈপরীত্য	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

DO NOT COPY

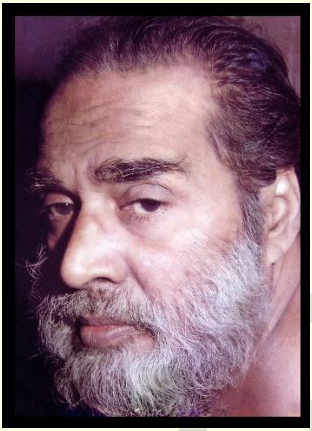

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"পরম শ্রদ্ধার বিকাশ তখনই, যখন সমস্ত কিছুর মধ্যেই আমরা ঈশ্বর কে অনুভব করব, প্রত্যক্ষ করব। যখন আমাদের দৃষ্টিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ সত্তার প্রকাশ, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি কর্মে, প্রকৃতির সকল সমগ্রতায় ঈশ্বরের উপলব্ধি – তখনই যোগ হয়ে ওঠে পূর্ণতম।"

DO NOT COPY

সারা মাসে খেয়াল থাকে না পার্থসারথির জন্য লিখতে হবে। মাসের প্রথম দিকে ছাড়া আজকাল পার্থসারথি ছাপা হয় না। কাজেই আমারও লেখাতে অনীহা দেখা যায়।

আবার পূজা এসে যাচ্ছে। পূজায় আমি প্রায় কোনও বারই কলকাতায় থাকি না। আগে N.C.C. Camp-এ যেতাম। এখন আর N.C.C. নেই, এখন বেড়াতে যাই। এই N.C.C.-র জন্য আমার অনেক ভালো ভালো Tour Program -me নষ্ট হয়েছে। বাড়ীর কারও সঙ্গে পূজার ছুটিতে কোথাও যেতে পারিনি। গরমের ছুটিতেও আমি প্রায় পনেরো বছর ধরে All India Summer Training camp নয়তো Mountaineering করেছি। X-mas holiday-তে করেছি Rock Climbing Course। শ্রীপ্রীতিকুমারের এসব কাজে অফুরন্ত উৎসাহ ছিল। তিনি খুব যত্ন নিয়ে আমার অনুপস্থিতিতে সংসার-ধর্ম পালন করতেন যেটা অনেকের কাছে চক্ষুশূল ছিল। লোকজনের সামনে ছেলেকে আদর করা চলতো না, স্ত্রীকে কিছু কিনে দেওয়া চলতো না। যেটা দিতেন, গোপনে।

যতদিন এ' বাড়ীতে সংসার করতে এসেছি, প্রায় ততদিনই চাকরী করছি। কারণ আমার চাকরী সেদিন শখের ছিল না। প্রয়োজন ছিলো তাই......।

এখন আমার শরীর হঠাৎ খুব ভেঙ্গে গেছে। এখান থেকে তিনবার বাস বদলাতে হয় কলেজে যাবার জন্য। সেদিন অসুবিধার কথা বলাতে শ্রীপ্রীতিকুমারের খুব কাছের একজন বললেন, "একটা গাড়ী কিনে নাও। কি আর এমন অসুবিধা? ...... "। শুনে হাসি পেয়ে গেলো। প্রয়াণের আগে শ্রীপ্রীতিকুমার কোনও একজন ব্যক্তির কাছ থেকে চরম আঘাত পেয়েছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত সেকথা বলতে গিয়ে তাঁর গলা ধরে আসতো। আমরা যারা শ্রীপ্রীতিকুমারের অনুগত, তারা চিন্তা করতে পারিনা ঐ রকম বাজে লোকের সাথে আর যোগাযোগ রাখা যায়। তাদের কাছে

আমাদের অনেক মূল্যবান সম্পত্তি গচ্ছিত আছে, তবু আমরা অনেকেই ঐ রাস্তা মাড়াই না।

শ্রীপ্রীতিকুমার একটি কথা বলেছিলেন, “আমার সন্তান একটি level-এর নীচে নামতে পারে না।” – আমি রেগে গিয়ে সেই সন্তানের প্রতি বিমুখ হয়েছি। কিন্তু গীতাদি, মনু ওরা বলেছে – “বৌদি, দাদা একথা বলেছেন। তাই বাপীকে এভাবে বিচার করা ঠিক নয়।” আবার আমি সন্তানকে আশ্রয় দিয়েছি।

অনেকে ভাবেন - আমার সন্তানকে সংসারী করালাম কেন? তারা যদি এই angle-এ ভেবে দেখেন যে আমার অবর্তমানে তাকে দেখবার কেউ নেই – আর বয়সকালে স্ত্রী যেভাবে সেবা করে মা বা অন্য কারো পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। বাড়ীতে যে কথা স্ত্রীর সাথে বলা চলে, মায়ের সাথে চলে না। তাই তাকে বিয়ে দিতে হয়। প্রতিটি stage-এ প্রত্যেকের আলাদা করে কর্তব্য থাকে। মায়ের দায়িত্ব স্ত্রী পালন করতে পারে না, স্ত্রীর দায়িত্ব সন্তান পালন করতে পারে না। সংসারে থেকে সব দায়িত্ব সময়ানুযায়ী পালন করতে হয়। তাই মা হিসাবে আমি আমার সন্তানকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে চেয়েছি। এখন অনেকে আবার ভাবছেন আমি ও আমার পুত্তর একই বাড়ীতে কি করে আছি। আজ খুব স্পষ্ট ভাবে বলে দিই আমার মতো মায়ের সাথে সংসার করা যে কোনও সন্তানের ভাগ্য ভালো না হলে সম্ভব নয়। আমি সব কাজ সেরে Rest নিই। আমি আমার সব টাকাটা সংসারের জন্য ব্যয় করি। আমার ছেলেও তাই করে। সবচেয়ে বড় কথা হল আমার পুত্র বা পুত্রবধূর আলাদা কোন fund নেই। এই understanding-টা আছে বলে কোনও অসুবিধে হয় না। নীতিগত বিরোধ হলে সে তো সাময়িক। আমার সে সব অভিযোগ শোনবার জন্য কিশোর আছে, কেয়া আছে, আমার বন্ধু ডঃ মীরা আগরওয়াল আছে। সংসারে শুধু নিজের সুখ দেখলেই হয় না, অন্যের সুখ ও দেখতে হয়।

আমার ছেলের বিয়েটা সহজে হয় নি। Lawyer-এর ও advice ছিলো

শুধু যাঁরা সই করবেন তাঁরাই যেন উপস্থিত হন। বেশী লোকের উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন নেই। শ্রীলার কথা মতো আমি আমার খুব নিকটজনকে বলতে গেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমার ছেলেরা বড় হয়েছে। যদি তারা সই করতে বলে তবে করবো।" এরপর আর তাঁর কাছে যাবার মুখ ছিলো না আমার। কারণ যাঁকে ছোটবেলা থেকে আমরা যমের মত ভয় করে এসেছি, এই বয়সে তিনি যদি বলেন "আমার ছেলেদের আগে জিজ্ঞেস করি" – তাহলে আমার আর দাঁড়াবার জায়গা কোথায়? .... যাক! এ' সবই সময়ের অপেক্ষা .... সময়ের হিসেব .... ।

গত ১৯৫০ সাল থেকে যদি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে যাই তাহলে কতবার কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে তার শেষ নেই। পাতার পর পাতা লেখা হয়ে যাবে। ঘটনার পাহাড়।

শুধু একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির স্ত্রী হবার জন্য যে কি দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। শ্রীপ্রীতিকুমার নিজেও সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন, তিনি নিজে সংসার জীবনে প্রবেশ করেছিলেন, তারজন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। একমাত্র সন্তানের সেবা নেবার সময় পর্যন্ত তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। আর বিশাল জনতা একটি দিনের জন্য তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। কোনও অনুমতির দরকার ছিল না। লোকেরা মনে হলেই চলে আসতেন। ফলে তিনি নিজেও যথেষ্ট অসুবিধে ভোগ করেছেন। শেষের দিকে শরীরে না কুলোলেও তিনি শ্যামবাজার যাবার চেষ্টা করেছেন, পাছে আমাদের কোনও অসুবিধে হয়। নিজের রোগের যন্ত্রণা নিজে ভোগ করেছেন। শেষের মাসখানেক ধরে খাবারগুলি শুধু নাড়াচাড়া করা দেখে আজ বুঝতে পারি তিনি জেনেছিলেন তিনি বেশীদিন থাকবেন না। কারণ ঐ রকম ভোজনবিলাসী ব্যক্তি, সব সামগ্রী সামনে গুছিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কিছু খাচ্ছেন না ভেবে বড় অবাক লাগে।

DO NOT COPY

একটা কথা আজ বলি। এই দীর্ঘ ছ’ বছরে আমার একটা শিক্ষা হয়েছে আজ স্বীকার না করে উপায় নেই। আমি ভীষণ একা হয়ে গেছি। আমার একটা পৃথক মনোরাজ্য গড়ে উঠেছে। সেখানে আমার পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনী কেউ নেই। মানুষের শেষ জীবনে কেউ কাছের থাকে না।

(** রচনাকাল – সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)

জীবন বিজ্ঞান **শ্রীমা**

লক্ষ্যহীন জীবন অর্থ দুঃখের জীবন।

প্রত্যেকে স্থির কর একটা লক্ষ্য; তবে মনে রেখ এই লক্ষ্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করছে তোমার জীবনেরও গুণাগুণ।

তোমার লক্ষ্য হয় যেন উন্নত ও বৃহৎ, উদার ও নিঃস্বার্থ, তাহলেই তোমার জীবন যেমন তোমার নিজের কাছে তেমনি পরের কাছেও সমান মূল্যবান হয়ে উঠবে।

কিন্তু আদর্শ যা-ই হোক না কেন তাকে তুমি পূর্ণ সিদ্ধ করে তুলতে পার না, যদি নিজের ভিতরে সিদ্ধি তোমার পূর্ণ না হয়ে থাকে। এই আত্মসিদ্ধির জন্য প্রথম দরকার নিজের সম্বন্ধে নিজের সত্তার বিভিন্ন অঙ্গ আর তাদের প্রত্যেকের আপন আপন ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। এই বিভিন্ন অংশগুলির প্রত্যেকটি পৃথক করে চিনতে হবে যাতে পরিষ্কার বুঝতে পার তোমার ভিতরে যত প্রবেগ, প্রতিক্রিয়া ও পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা উঠে তোমাকে কাজে প্রবৃত্ত করায় তাদের উৎস কোথায়। এই নিরীক্ষা বেশ দুরূহ এবং তার জন্য অনেকখানি অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা

থাকা দরকার; কারণ মানুষের প্রকৃতিতে, বিশেষ করে তার মন বস্তুটির মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তার সকল চিন্তা সকল অনুভূতি সকল কথা সকল কাজের স্বপক্ষে ওকালতি করবার। তবে এদের গতিবিধি অতি সন্তর্পণে লক্ষ্য করলে অর্থাৎ অন্য কথায় আমাদের উচ্চতম আদর্শের সামনে যদি এদের ধরতে পারি এবং তারই বিচার ঐকান্তিক সঙ্কল্প নিয়ে স্বীকার করতে পারি, তবেই আমাদের ভিতরে একটা অভ্রান্ত যথার্থবোধ গড়ে তুলতে পারব। বাস্তবিকই যদি চাই এগিয়ে যেতে, যদি চাই নিজের সত্তার সত্যটি জানতে - অর্থাৎ একমাত্র যে উদ্দেশ্যে আমাদের জন্ম, যাকে বলতে পারি এই পৃথিবীতে আমাদের ব্রত - তাহলে নিয়মিতভাবে এবং নিরন্তর নিজের ভিতরে জীবন সত্যের বিপরীত বা বিরোধী সব কিছুকে বহিষ্কার এবং বিলোপ করতে হবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সত্তার সমস্ত অংশ সকল উপাদান চৈত্য পুরুষকে কেন্দ্র করে একটা আত্মবিরোধশূন্য অখণ্ড জিনিস হয়ে উঠতে পারবে। এই ঐক্য সাধন সম্যক পরিমাণে কিছু করতে হলে অনেক সময় দরকার; তাতে সফল হতে হলে চাই ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা, একটা দৃঢ়তা যে এই প্রয়াসে সাফল্যলাভ না ঘটা পর্যন্ত যতদিন প্রয়োজন জীবন ধারণ করতেই হবে।

এই শুদ্ধিকরণ এবং ঐক্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে সত্তার বাহ্য এবং বহিরাঙ্গিক অংশকে নির্দোষ করে তুলতে। উচ্চতর সত্য যখন ব্যক্ত হবে তখন সে যেন তোমার মধ্যে পায় একটা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও নমনীয় মন; সে মন প্রকাশোন্মুখ ভাবকে যেন দিতে পারে এমন এক চিন্তাগত রূপ যাতে তার শক্তি ও জ্যোতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই চিন্তা আবার যখন ভাষায় রূপ নিতে চায় তখন সে যেন তোমার মধ্যে পায় যথেষ্ট প্রকাশ সামর্থ্য যাতে বিকৃত করার পরিবর্তে কথা ভাবকে প্রকাশই করে। সত্যকে মূর্ত করে তোলার এই যে সূত্র একে ফলিয়ে ধরতে হবে তোমার সকল অনুভূতিতে, সকল ইচ্ছায় ও কাজে, তোমার জীবনের সকল গতিবিধির মধ্যে। পরিশেষে এইসব গতিবিধিও পায় যেন অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে তাদের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

এ সবই সম্ভব হতে পারে একটা চতুর্বিধ অনুশীলন দিয়ে-সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়া হল এখানে। অনুশীলনের এই চারটি ধারা পরস্পর বিরোধী নয়, তাদের সব কটিকে যুগপৎ অনুসরণ করা যেতে পারে, আর সেরকম করাই শ্রেয়। আরম্ভ যা দিয়ে তার নাম বলতে পারি 'আন্তরাত্মিক অনুশীলন'। আমাদের অন্তঃকরণের কেন্দ্রকে আমরা বলি 'চৈত্যপুরুষ'- জীবনের ঊর্ধ্বতম সত্য তার মধ্যে, সে এই সত্যকে জানতে ও সক্রিয় করে তুলতে পারে। সুতরাং আমাদের ভিতরে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া একান্তই প্রয়োজন, এই অস্তিত্বের উপর এতখানি একাগ্র হতে হবে যাতে সে আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে, যাতে তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করে তুলি।

এই উপলব্ধি এবং পরিণামে এই সাযুজ্য লাভের জন্য দেশে দেশে যুগে যুগে নানা উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তার কতকগুলি মনস্তত্ত্বগত, কতকগুলি ধর্মভাবগত, কতকগুলি আবার একান্ত বাহ্যক্রিয়াগত। কার্যতঃ কিন্তু প্রত্যেকের উচিৎ তার নিজের উপযুক্ত উপায়টি আবিষ্কার করে নেওয়া; তার যদি থাকে জ্বলন্ত এবং অটল আস্পৃহা, অক্লান্ত এবং সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি, তবে যে পথে হোক – বাহিরের পঠনপাঠন অথবা উপদেশ কিংবা ভিতরের একাগ্রতা, ধ্যান, সাক্ষাতদৃষ্টি বা উপলব্ধি দিয়েই হোক - লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায় তার নিশ্চয় মিলবে। তবে একটি জিনিস একান্ত অপরিহার্যঃ উপলব্ধির এবং সিদ্ধির জন্য স্থির সঙ্কল্প। এই উপলব্ধি এই সিদ্ধিকে মনে করা চাই সত্তার প্রধান উপজীব্য, যে কোন মূল্য দিয়ে লাভ করবার মত মহার্ঘ মণিমুক্তা। যাই কর না কেন, যে উপজীবিকা যে কর্ম নিয়েই থাক না কেন, তোমার সত্তার সত্যকে আবিষ্কার করবার এবং তার সঙ্গে একীভূত হবার ইচ্ছাকে সর্বদা জাগ্রত রাখা চাই, জাগ্রত রাখা চাই তোমার সকল কর্ম সকল অনুভূতি সকল চিন্তার অন্তরালে।

এই আন্তর আবিষ্কারের সাধনা পূর্ণ করতে হলে মানসিক উৎকর্ষকে অবহেলা করা উচিৎ নয়। মন যন্ত্রটি সমানভাবে হতে পারে মহৎ সহায় অথবা

বিরাট অন্তরায়। মানুষি মন স্বভাবতঃ সর্বদাই ক্ষুদ্রদৃষ্টি, তার বোধশক্তি সীমাবদ্ধ, ধারণাবলী অনড় অচল। বিশেষ চেষ্টা দিয়ে তাকে বৃহৎ করতে হবে, সুনম্য ও গভীর করতে হবে। সেইজন্য প্রত্যেক জিনিসকে যত দিক দিয়ে সম্ভব দেখা ভাল। এই উদ্দেশ্যে একটা প্রক্রিয়া আছে যা চিন্তাকে অনেকখানি নমনীয় অনেকখানি উন্নীত করে। তা এই সুনির্দিষ্ট ভাষায় একটা মত স্থাপিত করা হল। তারপর তেমনি সুনির্দিষ্টভাবে বিরুদ্ধে একটা প্রতিমত দাঁড় করান গেল। তারপর সম্যক বিচার করে সমস্যাটিকে প্রসারিত করে খুলে ধরতে হবে কিংবা উঠে যেতে হবে তার ঊর্ধ্বে যে পর্যন্ত না পেয়েছি এমন এক সমন্বয় যা এই দুই বিরুদ্ধ মতকে এক বিশালতর, উচ্চতর, ব্যাপকতর সিদ্ধান্তের মধ্যে মিলিয়ে ধরে।

এই রকমের আরো অনেক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে। তাদের কতকগুলি চরিত্রের উপর সুফল আনে, সুফল দুরকমেরঃ এক, মনের উৎকর্ষ আর হৃদয়াবেগসমূহ ও তাদের প্রতিক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব। উদাহরণস্বরূপ, মনকে কখন কোন জিনিস বা ব্যক্তির বিচার করতে দেবে না; কারণ মন জ্ঞানের ইন্দ্রিয় নয়, জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, তবে তার উচিৎ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হওয়া। জ্ঞানের জগৎ মানুষি মন-স্তরের বহু ঊর্ধ্বে, বিশুদ্ধ বুদ্ধি জগতেরও অনেক ঊর্ধ্বে। মনকে হতে হবে নীরব এবং সজাগ যাতে উপর থেকে জ্ঞানকে গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারে; কারণ সে হল রূপদানের, সংগঠনের ও কর্মের যন্ত্র; এইসব ক্রিয়ার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ মূল্য ও যথার্থ সার্থকতা!

চেতনার ক্রমগতির পক্ষে আর একটা অভ্যাস অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে, তা হল কোন বিষয়ে কার সঙ্গে যখন মতদ্বৈধ হয়- একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে কি একটা কাজ করতে গিয়ে – তখন শুধু নিজের ধারণাটির মধ্যে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে নেই। বরং চেষ্টা করবে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিটিও বুঝতে, অপরের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দেখতে, এবং তর্কাতর্কি কি হাতাহাতি না করে এমন

একটা সমাধানে পৌঁছাতে যা উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হয়; সদিচ্ছা থাকলে এরূপ সমাধানের অভাব হয় না কখন।

এবার আমরা প্রাণ-নিয়মনের কথা বলব। ভিতরে প্রাণসত্তা হল বাসনা কামনার, উৎসাহ ও উগ্রতার, সক্রিয় শক্তি ও নিদারুণ নৈরাশ্যের মত্তাবেগ ও বিদ্রোহের কেন্দ্র। সব কিছু সে সচল করে তুলতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে, সিদ্ধ করতে পারে; আবার সবকিছু ধ্বংস করতে নষ্ট করতেও পারে। তাহলে দেখছি মানব সত্তার এই অঙ্গটিকে সুশিক্ষিত করা সবচেয়ে কঠিন। একাজ দীর্ঘকালব্যাপী কষ্টসাধ্য এবং প্রচুর ধৈর্য্যসাপেক্ষ, তার জন্য চাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতা, কারণ আন্তরিকতা না থাকলে প্রথম পদক্ষেপ থেকেই আত্ম-প্রবঞ্চনা শুরু হবে, উন্নতির সকল প্রয়াস ব্যর্থ হবে। অন্যপক্ষে, প্রাণের সহযোগে অবাস্তব কোন সিদ্ধিই আর অসম্ভব থাকে না, কোনও রূপান্তরই অবাস্তব মনে হয়না। তবে এই সহযোগ আদায় করাই এক দুরূহ ব্যাপার...।

প্রাণ ভাল কর্মী, তবে প্রায় সর্বদাই সে সন্ধান করে আত্মতৃপ্তি। তাতে যখন পূর্ণ অথবা আংশিক বাধা আসে তখন সে বিরক্ত বিমুখ হয়, অসহযোগ করে; ফলে উদ্যম প্রায় একেবারে চলে যায়, তার স্থানে আসে সব জিনিসের সব ব্যক্তির উপর বিতৃষ্ণা, আর নিরুৎসাহ অথবা বিদ্রোহ, হতাশা এবং অসন্তুষ্টি। এরকম সময়ে উচিত চুপ করে স্থির থাকা, কাজে প্রবৃত্ত না হওয়া; কারণ এই রকম সময়ে লোকে করে ফেলে যত কুকর্ম, অথবা কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস করে কিংবা নষ্ট করে মাসের পর মাস ধরে নিয়মিত পরিশ্রমের ফলে যা কিছু লাভ করেছিল, হারিয়ে ফেলে যা কিছু উন্নতি তার হয়েছিল। যারা তাদের চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সংযোগটি অনেকখানি সুদৃঢ় করে তুলেছে, ভিতরে জ্বলন্ত রাখতে পেরেছে আস্পৃহার অগ্নি এবং আরাধ্য আদর্শের চেতনা, তাদের পক্ষে এসব সঙ্কট অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী এবং কম বিপজ্জনক। এই চেতনার সহায়ে প্রাণকে বশে আনতে হয় দুরন্ত শিশুর মত – ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তার সামনে সত্য এবং আলো ধরে রেখে, যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিয়ে, তার মধ্যে

যে সদিচ্ছা এক মুহূর্তের জন্য আবৃত হয়ে পড়েছিল তাকে পূর্ণমুক্ত করে দিয়ে। এই রকম একটা ধীর প্রভাব সঞ্চারের কল্যাণে প্রত্যেক সঙ্কট হয়ে উঠতে পারে একটা নূতন উন্নতি, লক্ষ্যের দিকে আরো এক পা এগিয়ে যাওয়া। উন্নতি হতে পারে মন্থর, পদস্খলন হতে পারে বারবার, কিন্তু সাহস করে সঙ্কল্প যদি স্থির রাখা যায় তবে বিজয়লাভ একদিন হবেই, সত্য চেতনার আলোকরশ্মিপাতে গলে মিলিয়ে যাবেই সকল বাধা বিপত্তি।

পরিশেষে, একটা যুক্তিসম্মত জ্ঞানালোকিত শারীর শিক্ষার দ্বারা এ-দেহকে করে তুলতে হবে সমর্থ এবং সুনম্য যাতে সে আমাদের মধ্যে দিয়ে যে সত্যশক্তি প্রকাশ হতে চায় এই স্থূল পৃথিবীতে তার উপযুক্ত বাহন হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে শরীরের কাজ তো আদেশ করা নয়, আদেশ মেনে চলা; স্বভাবতই সে নিরীহ বিশ্বস্ত সেবক। তবে দুঃখের বিষয়, মন এবং প্রাণ এই দুটি প্রভুর সম্বন্ধে সব সময়ে সে বাদবিচার করতে জানে না। নিজের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েও তাদের সেবা করে যায় সে। মন তার বিধিনিষেধ, তার অনড় অচল যুক্তিহীন মতবাদ দিয়ে, প্রাণ তার আবেগ আর আতিশয্য এবং অপচয় দিয়ে শরীরের স্বাভাবিক সুসাম্য অচিরে নষ্ট করে দেয়, আনে ক্লান্তি অবসাদ ব্যাধি। তাকে এই অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে, আর তা একমাত্র সম্ভব চৈত্যপুরুষের সঙ্গে নিত্যসংযোগ দ্বারা। শরীরের আছে সকল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলবার এবং সহ্য করবার একটা অদ্ভুত শক্তি। এমন বহু কাজ করবার যোগ্যতা আছে তার যা সাধারণতঃ কল্পনায়ও আসে না। অজ্ঞান স্বৈরাচারী প্রভুদের পরিবর্তে সত্তার কেন্দ্রীয় সত্তা যদি তাকে চালায় তবে তার এই বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় পাব। শান্ত ও নির্বিচল, ধীর ও সমর্থ সে – তার কাছে যে কোন কর্মশক্তি দাবি করা যায় তাই সে সর্বদা জোগান দিতে পারবে, কারণ সে তখন কাজের মধ্যেই বিশ্রাম নিতে শিখেছে, বিশ্বব্যাপী শক্তিরাজির সঙ্গে সংযোগের ফলে সচেতনভাবে সুকাজে যে শক্তিকে ব্যয় করছে তা পূরণ করে নিতে পারে। এই সুস্থ ও সুষম জীবনে তার মধ্যে প্রকাশ পাবে একটা নূতন সুসঙ্গতি

DO NOT COPY

– ঊর্দ্ধতর লোকের সুসঙ্গতি, তা শরীরকে দেবে নিখুঁত পরিমিতি এবং গঠনের আদর্শ শ্রী। এই সুসঙ্গতির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ হয়ে চলবে, কারণ সত্তার সত্যটি স্থাবর নয় – একটা ক্রমবর্ধমান পূর্ণতার অন্তহীন প্রকাশ সে, নিরন্তর তা হয়ে উঠছে আরো ব্যাপক আরো উদার। যখন দেহে এই ক্রমোন্নত সুসঙ্গতির গতিধারা অনুসরণ করে চলতে শিখেছে তখনই একটা পরম রূপান্তর দ্বারা তার পক্ষে সম্ভব হবে লয় এবং বিনাশের প্রয়োজন অতিক্রম করে যাওয়া। তখন মৃত্যুর অমোঘ নিয়তি বলে কিছু থাকবে না।

আমাদের লক্ষ্য পূর্ণতার এই পদবীতে উঠলে দেখব আমরা চলেছি যে সত্যের সন্ধানে চারিটি প্রধান দিক তার; প্রেম, জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্য। সত্যের এই চারিটি গুণই আমাদের জীবনে একসঙ্গে প্রকাশ পাবে। চৈত্যপুরুষ হবে যথার্থ ও বিশুদ্ধ প্রেমের বাহন, মন অভ্রান্ত জ্ঞানের, প্রাণ প্রকাশ করবে অজেয় শক্তি ও তেজ, শরীর প্রকাশ করবে এক অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও সুসঙ্গতি।

** শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে

তেজস্বিতা ও শ্রীচৈতন্যের জীবন-বাণী

ডাঃ রুহিদাস সাহা

শ্রীচৈতন্যকে লোকে যে ‘সংকীর্ত্তন-পিতা’ বলে ডাকে তার কারণ দু’টি- প্রথমতঃ সংকীর্ত্তনে আরাধ্য-পুরুষ তিনি, দ্বিতীয়তঃ তিনি সংকীর্ত্তনের জন্মদাতা অর্থাৎ সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক-পুরুষ। ‘সংকীর্ত্তন’ বলতে উচ্চকণ্ঠে সম্মিলিত ভজন বুঝায়। সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত কারণে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন কিন্তু সহজ সাধ্য ছিল না। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস নানা ঘাত প্রতিঘাতে যুদ্ধ বিগ্রহে পর্যুদস্ত, জনমন ভয় ভীতিতে বিহ্বল। নবদ্বীপও এই অবস্থার ব্যতিক্রম ছিল

না। তাই তো শ্রী রাম পণ্ডিত তাঁর ভাইদের নিয়ে নিজগৃহে কীর্ত্তন করলে হিন্দুরা দল বেঁধে শ্রীরাম পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে শাসিয়ে যেত; বলতো – তোমাদের এই কীর্ত্তনের কথা কাজীর কানে পৌঁছলে সারা নবদ্বীপেরই অমঙ্গল হবে। তাই তারা কীর্ত্তন বন্ধের নির্দেশ দিয়ে যেত এবং নির্দেশ অমান্যে শ্রীরামের ঘর দোর ভেঙ্গে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবার কথাও জানাতে ভুলে যেত না। এই ভীত সন্ত্রস্ত মানসিকতা প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। কখনও ভয় পাবার কারণ বর্ত্তমান ছিল, কখনও ছিল না। ভয়ের কারণ বর্ত্তমান না থাকলেও কিন্তু অনেক সময় ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা থেকে সমাজ মুক্ত ছিল না। কারণে অকারণে এই ভয়ার্ত মানসিকতা একটি জাতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

ভয়ার্ত মানসিকতা থেকে উদ্ধার করতে পরিত্রাতা রূপে এগিয়ে এলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি উপদেশ দিলেন না, বক্তৃতাও করলেন না। একেবারে বাস্তবসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন। তাঁর সমস্ত কর্মের সাথী যারা, তাঁর কাছে সবার উপরে সত্য যারা, সেই মানুষকে একত্রিত করে তিনি সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করলেন। ক্রমে ক্রমে নগরে নগরে সংকীর্ত্তন অভিযান চালালেন তিনি। তাঁর এই অভিযান ভীত সন্ত্রস্ত মানসিকতার বিরুদ্ধে, কীর্ত্তনের বিরোধী যারা তাদের বিরুদ্ধে। তাঁর এই অভিযান কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিল না, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র স্পর্শ করতে পারেনি। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানও তিনি পড়েছিলেন। এই কীর্ত্তন অভিযানের মধ্য দিয়ে তিনি শুধু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণের অধিকার সকলেরই জন্মগত অধিকার, সে যে ধর্ম্মাবলম্বী হোক না কেন।

কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের পর নানা সময়ে নানা জনে নানা কথা বলেছে। কেউ বলেছে, নিমাইকে ধরতে নৌকা ভর্ত্তি হুসেন শাহের পাইক আসছে। কেউ আবার বলেছে, এবার নিমাইকে হাজতবাস করতেই হবে। এ সব কথা শুনেছেন নিমাই, তবুও ভয়শূন্য থেকেছেন। বলেছেন - বেশ তো আসুক না সে নৌকা। আমি নিজেই গিয়ে উঠবো তাতে।

DO NOT COPY

হুসেন শাহের নৌকা কিন্তু কোনদিনই আসেনি। হয় এই প্রচার ছিল একান্তই গুজব, নয়তো এই কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক যিনি সেই গৌরাঙ্গের তেজস্বিতা সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল শাসকের, তাই তো তাঁর সম্মুখীন হয়ে একটা অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করায় সাহসী ছিলেন না তাঁরা। হুসেন শাহের একটা অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁর একটা শ্রদ্ধার মনোভাব এর একটা কারণ হতে পারে।

সংকীর্তন প্রবর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ এক প্রতিকূলতা তো প্রতিহত করলেন, এবার নতুন প্রতিকূলতা চলার পথে এসে হাজির হল, তা আঘাতও আনলো।

সময়টা পঞ্চদশ শতাব্দী। বল্লালী বর্বরতা তখন তুঙ্গে। মনুষ্যত্বের অপমানে সমাজ হয়ে পড়েছে পঙ্গু। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষকে অবহেলায় ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের ছায়া মাড়ালে নাকি পাপ হতো, সে পাপের মুক্তি হতো গঙ্গাস্নানে! এমন ভয়াবহ যখন সামাজিক অবস্থা তখন শ্রীগৌরাঙ্গের সাম্য ও ঐকতানের মন্ত্রে উদ্বেলিত কীর্ত্তনে সামিল হয়েছে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষও। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করতো যারা তাদের কাছে এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠলো। 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' বলে রব তুললো তারা। মানুষে মানুষে মিলনের মাধ্যম সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে, এর প্রবর্ত্তক পুরুষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার তুললো তারা, নিন্দেবাদ করতে লাগলো, কোমর বেঁধে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তেজস্বিতাই যাঁর স্বভাব সুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট সেই শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যর্থ হল তারা। এবার শুরু হল ষড়যন্ত্র। শাসকের দ্বারস্থ হল ওরা। শ্রীগৌরাঙ্গের নেতৃত্বে সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানে শাসককুল শঙ্কিত হয়েছিল। গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে নতুন করে বিরুদ্ধতা শাসককে শক্তি জোগালো। উভয়ের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে কীর্ত্তন বন্ধের আদেশ ঘোষিত হল, আদেশ অমান্যে মৃত্যুদণ্ডের কথা প্রচারিত হল। ভীত হলেন না গৌরাঙ্গ। বরং তিনি গর্জে উঠলেন, সকলকে ডাক দিলেন কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণ করতে। শ্রীগৌরাঙ্গের dynamic personality-এর জন্যে সঙ্গে সঙ্গে জনসমুদ্র দেখা দিল। শ্রীগৌরাঙ্গের নেতৃত্বে গণ অভিযান কাজীর দরবারে এসে উপস্থিত হল। ভীত হলেন কাজী, আদেশ প্রত্যাহার

করতে বাধ্য হলেন তিনি। সংকীর্ত্তন করার সশ্রদ্ধ অনুমতি পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

বীরত্বই শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন সঙ্গী। বীরত্বেই সীমাহীন কুকর্মের নায়ক জগাই মাধাইয়ের জীবনে তিনি পরিবর্ত্তন ঘটালেন। জগাই মাধাই নামেই ছিল নগর কোতোয়াল, প্রকৃতপক্ষে তারা দুজনেই ছিল বর্বর দস্যু। তারা ঘড়া ঘড়া মদ খেতো আর নারী নির্য্যাতন চালাতো। লুঠতরাজে তাদের তুলনা মিলতো না। তারা যা চাইত তা না পেলেই ঘর দোর জ্বালিয়ে দিত। হিংস্রতায় তারা ছিল পশুর তুল্য। কত শত মা বোনের চোখের জলের কারণ ওরা। নবদ্বীপের মানুষ তাই ওদের কাছে যেতে ভয় পেতো, ওদের দূর থেকে দেখেই লোকে ভয়ে পালাতো। এমন দুজন মানুষরূপী পশুকে আজীবনের হিংস্র প্রকৃতি থেকে উদ্ধার করে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের মাধ্যমে তাদের মনুষ্যত্বে দীক্ষা দিলেন। জগাই মাধাইয়ের এই পরিবর্ত্তনের ফলে এতদিনের ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে আনন্দে দিন যাপন করতে লাগলো। ভয়ংকর জগাই মাধাইয়ের জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গ পরিবর্ত্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর জীবনের অনন্য তেজস্বিতার জন্যেই।

শাস্ত্রানুসারে, ব্রাহ্মণের কাছে ব্রাহ্মণেতর হিন্দুকূলে জাত লোক অস্পৃশ্য এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে হিন্দুকূলে জাত শূদ্রের দর্শন স্পর্শনও নিষিদ্ধ। তাদের শবদেহ তো আরো অস্পৃশ্য। শ্রীচৈতন্য নিজে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী উভয় হয়েও এমন একজনের শবদেহ কোলে নিয়ে নৃত্য করেছিলেন কায়েমী স্বার্থের ধারক বাহকদের কাছে যিনি হিন্দু নন, তাদের দৃষ্টিতে যিনি ‘যবন হরিদাস’। শ্রীচৈতন্যই হরিদাসের শেষকৃত্য সম্পাদন করেছিলেন, হরিদাসকে সমাধিস্থ করার সময় তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর দেহে ‘বালু’ দিয়েছিলেন। এমনকি হরিদাসের নির্বাণ মহোৎসবও তিনিই সম্পাদন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের এই আচরণ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ভয়ংকর অস্পৃশ্যতার যুগেও শ্রীচৈতন্যের পক্ষে একাজ সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাঁর চরিত্রে ছিল অনন্য বলিষ্ঠতা।

তেজস্বিতার এমন অনেক ঘটনা শ্রীচৈতন্যের জীবনে ছড়িয়ে আছে। কৈশোর থেকে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর সারাটা জীবনই অসীম সাহসিকতার

DO NOT COPY

জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি বক্তৃতা করেননি, উপদেশ দেন নি, বাণী প্রচার করেন নি, নিজের জীবনে আচরণের মধ্য দিয়েই তাঁর চারিত্রিক তেজস্বিতার প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর জীবনই তাঁর বাণী, তেজস্বিতাও শ্রীচৈতন্যের জীবন বাণী।

যথার্থই “চৈতন্য ভাগবতে’ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁকে ‘মহাবলী গৌর সিংহ’ বলে সম্বোধন করেছেন, আর ‘শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত’তে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন - ‘চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুংকার।’

‘হিন্দুদর্শন’ **শ্রীমতী মাধবী ঘোষ**

দর্শন ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ। হিন্দুদর্শন হইতেছে তত্ত্বমূলক জ্ঞান। সাহিত্যে, ইতিহাসে, ধর্মনীতিতে, অর্থশাস্ত্রে এমন কি বিজ্ঞানে আমরা দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানমূলক জ্ঞান হইতে বৃহত্তর।

বিজ্ঞান বিভিন্ন ভাগ লইয়া আলোচনা করে। পার্থিব বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণ হইতেছে বিজ্ঞানের কাজ। রাসায়নিক, পদার্থবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, কৃষি বিভাগ এই জীব ও জড়জগতের সম্যক আলোচনা করে, কিন্তু দর্শনের কাজ সমগ্র বিভাগের আলোচনার মাধ্যমে জড়জগতের সহিত জীবজগতের উৎপত্তি বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক নির্ণয় করা। জড় জগৎ হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে। জল, বায়ু, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি লইয়া জড়জগতের সৃষ্টি।

এই সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ। উভয়ের সংযোগে অচেতন প্রকৃতি ও পুরুষ পঞ্চবিংশতি কার্য্যের সৃষ্টি করিল। পুরুষ চেতন – মুক্তপুরুষ।

প্রকৃতি পুরুষের অংশ স্বরূপ। ইহা মায়া বা হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইয়াছে।

DO NOT COPY

প্রকৃতি হইতে অহং, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি। প্রকৃতি অচেতন।

কার্য্যগুলি হেতুমৎ, ব্যক্ত, সক্রিয়, আশ্রিতং, আপুরণম্। এই জীবজগৎ ও জড়জগৎ পরম ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ, দর্শন চর্চ্চার সার্থকতার মূলে রহিয়াছে তুরীয় সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করা। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি – ইহা পরম পুরুষের কীর্ত্তি। ইনি পরম ঈশ্বর – চৈতন্যময়। নির্বিকার ব্রহ্ম। ইংরাজীতে - Omnipotent, Omniscient and protector of Dharma and Saviour of humanity। পরম ঈশ্বরকে সত্য, শিবম ও সুন্দরম্ রূপে কল্পনা করা হয়।

He is preserver, destrtoyer of the Universe. He brought Heaven in this earth, enlightening the human heart from narrowness and selfish motive. God is the moral governor.

ঈশ্বর শৃঙ্খলা ও নীতির সমর্থক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্রহ্মকে Absolute, the supreme cause রূপে বলা হয়।

এই পরম পুরুষের বর্ণনা – ন্যায়, বৈশেষিক যোগ ও বেদান্ত দর্শনে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, আত্মার অস্তিত্ব ও পার্থিব জগৎকে স্বীকার করিয়াছে। বৌদ্ধমতে আত্মা ক্ষণিকের, সর্বম্ দুঃখম্। এই মতবাদকে Nihilism বলা হয়।

ভারতের মানুষের দার্শনিক পিপাসা কত গভীর ও অসীম এই সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রথা থেকে তার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায়। অসীম থেকে অসীমের মধ্যে, অজানার ও অচেনার মধ্যে বারে বারে আঘাত হেনেছে অনুচ্চারিত কোন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন মানসে। মানব মনের এই প্রেরণা ও প্রবৃত্তি তথাগত বুদ্ধের মনকে নতুন এক দার্শনিক চিন্তায় আলোড়িত করে তুলেছিল।

দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল আর্য্য অনার্য্যের সামাজিক ও ধর্মীয় সংমিশ্রনের ফলে।

সমগ্র বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে গেলে কার্য্য কারণ শৃঙ্খলের গ্রন্থিতে গ্রথিত বলে মনে হয়। (বিশ্ববাণী...)

DO NOT COPY

দর্শনচর্চা মানুষকে দিয়েছে 'অভয়মন্ত্র'।

রামলালের গানের মধ্যে পাই-

ঘটে ঘটে তুমি ঘটে আছে গো জননী
মূলাধার কমলে থাক মা কুলকুণ্ডলিনী।
তদূর্ধেতে আছে মাগো নামে স্বাধিষ্ঠান
চতুর্দশ পদ্মে তথায় আছ অধিষ্ঠান।
ওমা, ভক্তজন্য চরাচরে তুমি যে সাকার,
পঞ্চে পঞ্চে লয় হলে তুমি নিরাকার।
তদূর্ধেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল
ধুম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শ দল।
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ।

"ষড়চক্র ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রার পক্ষে গিয়ে মিলিত হয়। কুণ্ডলিনী যেখানে গেলে সমাধি হয়, বেদমতে এই চক্রকে ভূমি বলে। সপ্তভূমি। হৃদয় চতুর্থ ভূমি। অনাহত পদ্ম-দ্বাদশ দল।

এখানে কুলকুণ্ডলিনী (কুল=মহাশক্তি কালী) কুণ্ডলিনী=মহাপ্রকৃতি, পরম কারণ নাদ, সুতরাং নাদই মহাশক্তি কালী, এই শক্তিকে জাগাতে হয় সাধন বলে এই শক্তিই সাধন শক্তি। কুণ্ডলিত শক্তিকে ঊর্দ্ধদিকে চালনা করলে তত্ত্বের উদয় ও বিলয় হয়। সাধক মহাশক্তির অধীশ্বর হন।

যোগশাস্ত্রেও শব্দমন্ত্রের জপ ও অর্থ ভাবনার কথা বলা হয়েছে। "তজপস্তদর্থভানম্ -- পাতঞ্জল দর্শন"।

শক্তির দুটি রূপ- রৌদ্র ও শিবময়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একে বলেছেন Necromancy। সাধন শক্তির ক্ষমতা অলৌকিক, অথচ তা যাদু নয়। যাদুতে রয়েছে মিথ্যা কৌশল ও বিভ্রম। সেইজন্য সমাজতত্ত্ববিদ Henry Lewis Morgan

DO NOT COPY

বলেন, their system was more or less Vague & Indefinite and loaded with crude superstitions. ------ (বাণী বিচার... বিশ্ববাণী)

যোগের আটটি অঙ্গ - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যোগের আন্তর সাধন ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ধ্যান, ধারণা ও সমাধির একত্র সমাবেশে যোগ বিভূতির পূর্ণ প্রকাশ।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের প্রতীক স্বরূপ পাঁচটি লিঙ্গরূপী শিবের প্রকাশ 'দাক্ষিণাত্যের দেব দেউলে' দেখিতে পাওয়া যায়।

জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন আত্মমুক্তির উপায় নির্দ্ধারন। আত্মার বদ্ধ অবস্থা বা bondage অজ্ঞানতার নামান্তর ---- আত্মার মুক্তি হইতেছে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Self Liberation না হইলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের উপায়গুলি উপলব্ধি করিতে হয়। জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়। মিথ্যা জ্ঞানকে অপ্রমা বলা হয়। সংবেদন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থপতি জ্ঞানের বিভাগ।

ন্যায়, বৈশেষিক দর্শন জ্ঞানের প্রকাশরূপ সংবেদন, প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান স্বীকার করে। সাংখ্য উপরোক্ত প্রকারগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। জৈন, বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে জ্ঞানের প্রকাশরূপে স্বীকার করে।

যোগদর্শন, বেদান্ত জ্ঞানের প্রকাররূপে সংবেদন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও অর্থাশক্তিকে স্বীকার করে।

ঈশ্বর পরম পুরুষ-ইহা নির্গুণ ব্রহ্ম ---
সমস্ত গুণের অতীত-Transcendental Spirit.

তন্ত্রশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রে অনাহত শব্দকে 'নাদ' বলা হয়। নাদ ও প্রণব স্বরূপে এক।

আচার্য্য শঙ্কর-এর মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য....জগৎ মিথ্যা....।

মহেশ্বরের শক্তির উৎস হইতেছে প্রকৃতি, পুরাণে যাহাকে শ্রীচণ্ডী নামে অভিহিত করিয়াছে। তিনিই এই বিশ্বসৃষ্টির কারণ। অগ্নি, তেজ, জল, বায়ু দ্বারা গঠিত এই

লীলাময় জগৎ আনন্দময় ব্রহ্মেরই অংশ । মহেশ্বর সকল কিছু ধ্বংসের বা প্রলয়ের কারণ। শশিকলাকে তিনি ললাটে অর্থাৎ কপালে ধারণ করেন। মহেশ্বর-মহাপ্রকৃতি হইতে ভিন্ন। পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয়, সেই সময় প্রলয়ের দ্বারা মহেশ্বর এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন।

বোধের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং ঈশ্বর 'এখানে' দেহের বা নিজের মধ্যে এই প্রত্যয় যতক্ষণ - ততক্ষণ 'জ্ঞান' বা যথার্থ প্রতীতি-

তং দুর্দর্শং গূঢ়মণি প্রবিষ্টং
গুহাহিত গহ্বরেষ্টং পূরাণয়।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।।

চৈতন্যময় আত্মা পুরুষকে যিনি হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বাস করেন জানেন তিনি জ্ঞানী। আত্মদর্শন বা অদ্বৈত দর্শন 'খলু অমৃতত্ব মিতি' জ্ঞান-অমৃতত্ত্ব বা মুক্তি-

ত্যাগ এব হি সর্বেষা মুক্তানামপি কর্মনাম্
বৈরাগ্যং পুনরেতম্য মোক্ষস্য পরমোবিধি।

গেঁওখালি ভ্রমণ কথা **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য**

কলকাতার কাছে পিঠে গাদিয়ারা, ফলতা, ডায়ামণ্ডহারবারের মত এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে সাধারণভাবে শীতের পিকনিক জমাতে লোকে ভিড় করলেও দু' তিনটে দিন দিব্য কাটিয়ে দেওয়া যায় নদীর হাওয়া খেয়ে– বিশেষতঃ যদি তাপস, সমর দিবাকরের মত বন্ধুরা সঙ্গে থাকে। তেমনই এক জায়গা অতীতের জীবনখালি তথা আজকের গেঁওখালি। পূর্ব মেদিনীপুরের যে জায়গাকে প্রথম দেখেছিলাম দূর থেকে – হাওড়ার গাদিয়ারায় পিকনিক করতে গিয়ে। মহিষাদল ব্লকের গেঁওখালি গ্রামের সবটুকুতো আমরা দেখিনি, তবে হুগলী, দামোদর আর

DO NOT COPY

রূপনারায়নের ত্রিবেণী সঙ্গমে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ‘ত্রিস্রোতা’য় ৯ থেকে ১১ ই এপ্রিল আমরা যে মজায় মজেছিলাম তা ছিল সত্যিই একঘর! উপরি পাওনা হিসেবে ছিল চলার পথে মহিষাদল রাজবাড়ি। ইতিহাসের গল্প খুঁজে আর ত্রিবেণী সঙ্গম কমপ্লেক্সের উদার প্রকৃতির মাঝখানে আড্ডা মেরে সময় যে কখন দৌড়ে পালিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। খেয়ালও করলাম না যাওয়া আসার পথে তিনদিনে কত গল্প তৈরী হয়ে গেল। শুরু হয়েছিল অবশ্য সমর সোমার বাড়িতে আমাদের উঠলো বাই তো গেট টুগেদারের আড্ডায়। দু’দিনের সফরে দুই ফ্যামিলির বেড়িয়ে পড়া এর আগে অনেকবার হলেও চার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক একসাথে বাইরে গেছিলাম একবারই - ১৯৯৫ সালে বকখালিতে। ৩০ বছর পরে তৈরি হওয়া এই গল্পটায় কেমন একটা ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ আর ‘আবার অরণ্যে’র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? তফাৎ, সেখানে ছিল জঙ্গল আর এখানে জল – এতটুকুই। গেট টুগেদারে অবশ্য ঠিক করতে পারিনি কি ভাবে গেঁওখালি যাওয়া হবে। গাড়ি নিয়ে কলকাতা থেকে অবশ্যই যাওয়া যায়, তবে হাওড়া থেকে ৯.২০-র হলদিয়া গ্যালপিং চেপে সতীশ সামন্ত হল্টে নামাও কিন্তু মন্দ নয়। সমস্যা দেখলাম একটাই। ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ৩৮০৫৩ হাওড়া-হলদিয়া ছাড়ার কথা থাকলেও সেটা ১৩, ১৪ এমন কি নতুন কমপ্লেক্সে থেকে ছাড়লেও বলার কিছু নেই। কম বয়সে এটাকে পাত্তা না দিলেও শেষ মুহূর্তে স্টার্টিং পয়েন্টটা ১৪’র বদলে ১৯ নম্বর হয়ে যাওয়ায় ছুটোছুটির সাথে ভাবনাও কিছু কম হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব ভালোতেই ট্রেনের দৌড় শুরু হয়ে গেল। তিন তিন ছয় জনের সিটগুলোয় দুই দুই চার জন করে বসে হাজারো গল্পের মাঝখানে কখনও ঝালমুড়ি কখনও আলুর চপ, মোচার চপ আর চায়ের চুমুকে দু’ঘন্টার সামান্য বেশি সময়ে ১০৩ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম সতীশ সামন্ত হল্টে। স্টেশন থেকে মহিষাদল রাজবাড়ি বড় জোর দু’কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে। টোটো ভাড়া জনা প্রতি ১০ টাকা হলেও কলকাতার বাবুদের জন্য সেটা হয়ে গেল ২০ টাকা। খুব বেশি আপত্তি করিনি কারণ ১০ টাকার অটোয় এরা যথেচ্ছ যাত্রী তুললেও আমাদের দুটো অটোতে যার যার ব্যাক প্যাক

DoNotCopy

সমেত ছিলাম শুধু আমরাই। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, সতীশ সামন্ত থেকে রাজবাড়ি অথবা উল্টো পথে গেঁয়োখালি যাওয়ার বাসও পাওয়া যায়, তবে বেড়াতে বেরিয়ে সেটুকু অপেক্ষা আর কে করে!

অটো আমাদের যেখানে নামিয়ে দিল সেটাই ১৯৩৪ সালে তৈরী হয়া ফুলবাগ প্যালেস অর্থাৎ নতুন রাজবাড়ি। ২০ টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশের আগেই বুঝেছি রাজবাড়ির সামনে কামান সমেত জায়গাটা ফটো সেশনের জন্য দারুণ আইডিয়াল। রয়েছে ডানদিকের ময়দানে মহাদেব আর গর্গরাজার মূর্তি। বাঁয়ে একটু হাঁটলেই পুরানো রাজবাড়ি সমেত বিশাল আমের বাগান। আর ভিতরে? একতলার তিনটি মিউজিয়ামে রাজাদের ব্যবহৃত জিনিষপত্র, শিকারকক্ষ আর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রাসাদের ভিতর মহল চোখ টানে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাকে যে ক্যামেরা বন্দি করার অনুমতি নেই! অনুমতি নেই বর্তমান মালিক শঙ্কর প্রসাদ আর হরপ্রসাদ গর্গের প্রাসাদের উপর মহলে ওঠবার। তবু ভালো যে বাইরের বারান্দায় রাখা বিশাল রাজকীয় পালকিকে মোবাইল বন্দী করতে পেরেছিলাম সোমা-বুবুন-কাকলি-দিবাকর সমেত। সে ব্যাপারে কোন নিষেধ ছিল না।

মহিষাদল রাজবাড়ির ইতিহাস কিন্তু আজকের নয়। সেই ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে জীবনখালির রাজা কল্যাণ চৌধুরীর কাছ থেকে স্বত্ব কিনে নতুন রাজা হন সম্রাট আকবরের সেনাধ্যক্ষ উত্তর প্রদেশ নিবাসী জনার্দন উপাধ্যায়। পরবর্তী কালে তার উত্তরসূরী আনন্দলালের মৃত্যু হলে রাজ্যের দায়িত্ব নেন রাণী জানকী দেবী। রাণী অপুত্রক ছিলেন বলে তার মৃত্যুর পর রাজা হন তার কন্যা রাণী মন্দুরার পুত্র গুরুপ্রসাদ গর্গ। শুরু হয়ে যায় গর্গ রাজাদের রাজত্ব। স্বাধীন ভারতে রাজ-ক্ষমতা চলে গেলেও প্রাসাদের মালিকানা যে আজও গর্গ পরিবারের সে কথা তো আগেই বলেছি। রাজবাড়ি ছাড়াও রয়েছে ১৭৭৪-এ জানকী দেবীর প্রতিষ্ঠিত গোপালজীর মন্দির। দেখে মনে হয় পরবর্তী কালে ১৮৫৫ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি তৈরী হয়েছিল এর আদলেই। মন্দিরে রয়েছে জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রার মূর্তি। এদের নিয়ে সেই সময় থেকে যে রথযাত্রা শুরু হয়েছিল, সে প্রথা আজও চলে

আসছে। মন্দির খোলা থাকে সকাল ৭টা থেকে ১২টা, আবার দুপুর ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। সময়ের বেড়াজালে আমাদের দেব দর্শন হয়নি বটে, কিন্তু মন্দির দর্শন করায় তো কোন বাধা ছিল না।

মহিষাদলে আমরা রাত কাটাইনি বটে কারণ তার কোন প্রয়োজনও ছিল না, কিন্তু আপনি চাইলে রাজভবনে একটা রাত কাটাতেই পারেন দু'জনের ঘরে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়ায়। বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে ২০০০ টাকায় সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত থাকার। তবে যা বুঝেছি সেক্ষেত্রে যে ঘর দেওয়া হয় তা মূলত বিশ্রাম নিতেই, সেখানে রাজবাড়ির আমেজ মেলেনা। বরং ৬০০ টাকায় মাছের সাথে চিকেন থালি অথবা ৭০০ টাকার মাছের সাথে মাটন থালিতে রাজকীয় খানার গন্ধ মেলে।

রাজবাড়ি থেকে গেঁওখালি প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে। বাসে এলে যেখানে নামতে হয় সেই বাসস্ট্যান্ডেই গেঁওখালি বাজার। সেখান থেকেও যে আমাদের গন্তব্য 'ত্রিস্রোতা' আরো ২.২ কিলোমিটার দূরে সেটা দুটো টোটো ভাড়া করে রাজবাড়ি থেকে চেপে বসার সময় বুঝতে পারিনি। পথের দূরত্ব আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রতি ভাড়া চল্লিশ টাকাকে যথেষ্টই কম মনে হয়েছে, বিশেষতঃ এক্ষেত্রেও যখন টোটোতে আমরা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। ১১ ঘরের ত্রিস্রোতায় দুটো রাত কাটাবার ব্যবস্থা তাপস গেট টুগেদারের দিনেই করে ফেলেছিল সমর সোমার ফ্ল্যাটে বসে। দোতলার চারটি ঘরই যখন আমাদের নামে সংরক্ষিত তখন পথে একটু দেরী হলেও চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু পেটের আগুন? ট্রেনের রসদের জোরে রাজবাড়ির থালিকে উপেক্ষা করলেও সেখান থেকে খাদ্য রসিক দিবাকর যে ত্রিস্রোতা লাগোয়া ত্রিবেণী সঙ্গমের হেঁশেলে মাছ ভাতের অর্ডার দিয়ে রেখেছিল সেটাই রক্ষে, না হলে দুপুর দুটোর পর হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কমপ্লেক্সে পৌঁছে খাবার অর্ডার দিলে আর দেখতে হতো না – আমরাই হজম হয়ে যেতাম! দোতলার প্রত্যেকটা ঘরের সামনেই বারান্দা। সেখান থেকে তো বটেই এমন কি ঘর থেকেও কাঁচের দেওয়ালের কল্যাণে তিন নদীর মেলামেশা দিব্য দেখা যায়।

DO NOT COPY

কিন্তু সে শোভা দেখার মেজাজ তখন কোথায়? পেটের ঘড়ির অ্যালার্ম যে লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে বসে আছে।

ত্রিবেণী সঙ্গমের ক্যান্টিনে ডাল, ভাত, ভাজা, তরকারি, চাটনি আর স্যালাডের নিরামিষ মাত্রই ১০০ টাকা। এর সাথে কাতলা মাছ যোগ হলে সেটা ১৫০-এ দাঁড়ায়। চাইলে অন্য কোন মাছ নিয়ে অঙ্কটাকে ২০০-২৫০-৩০০ বানাতেই পারেন, তবে ক্ষিদের মুখে গরমাগরম কাতলা-ভাত রেডি পেয়ে আর অপেক্ষার রাস্তায় আমরা যাই নি। খাবার শেষে দিবাকরের সন্দেশে যেন অমৃত যোগ। আর অমৃত লোক? সে যেন সবাই খুঁজে পেল ঠান্ডা ঘরের যার যার নরম বিছানায়। তারপর? ভোর থেকে মাঝ দুপুর পর্যন্ত ছোটাছুটির পর সিনিয়র সিটিজেনের দল যদি আগেকার ম্যাটিনি শোয়ের (৩-৬) সময় ধরে ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় তাতে ক্ষতি কি! ত্রিস্রোতার সামনে যেমন তিন নদীর সঙ্গম, তেমনই দেখা যায় হাওড়ার গাদিয়ারার সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নুরপুরও আর পূর্ব মেদিনীপুরের গেওঁখালিতে তো আমরা অবস্থানই করছি। সামনে শুধু নদীর উচ্ছ্বাস নয়, জোয়ারের জলে ভেসে আসে একের পর এক দেশি বিদেশি জাহাজ হলদিয়া বন্দর থেকে, গন্তব্য তাদের গঙ্গাসাগর হয়ে কোন সুদূরে কে জানে! আর পিছনেও যে মাঝারি এক দিঘীকে কেন্দ্র করে রয়েছে আধা অরণ্য, তা সদলবলে জঙ্গল পথে না হাঁটলে জানতেই পারতাম না। শীতের দিনে জলে যে নৌকাবিহার হয় তার প্রমাণ ঘাটেই রয়েছে আর রয়েছে দিঘীর দর্পনে সারি সারি গাছের প্রতিফলন। সবচেয়ে বড় চমকটা বোধহয় বিদায় বেলার সূর্য! গাছের আড়ালে এই আছে এই নেই এর মধ্যে হঠাৎ খোলা আকাশে তার শেষ সম্ভাষন! একেবারে মধুরেণ সমাপয়েৎ!

সন্ধ্যার আড্ডায় কফি, ভেজ আর অনিয়ন পকোড়ার সাথে কাকলি, সোমা, দিবাকরের আনা ভুজিয়ারা রাতের ডিনারকে আউট করতেই পারতো, কিন্তু চিকেন কষা আর গরম রুটির অর্ডার তার আগেই হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ে পরদিন রাতে ডিনার অফ করেছিলাম বটে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ভেজ অনিয়নের সাথে যোগ হয়েছিল চিকেন পকোড়াও। তাতে কি আর দিবাকরের মন ভরে? হঠাৎই

আধ ঘণ্টার জন্য হাওয়া হয়ে ১০ টাকার অটোয় গেঁওখালি বাজার থেকে এত আপেল, আঙ্গুর আর মিষ্টি নিয়ে এল যে ডিনারের ভাবনা নদী পেরিয়ে সোজা নুরপুরে।

পরদিনের সকাল মুগ্ধ করেছিল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় অসাধারণ সূর্যোদয়। ঘরের বারান্দা থেকে নদীর ওপারে তার আত্মপ্রকাশ দেখাই যায়, কিন্তু আমি আর বুবুন চাইছিলাম ভোরের নদীর সঙ্গী হতে। কেউ কাউকে ঘুম ভাঙ্গাবো না ভাবনায় থাকলেও গুটি গুটি পায়ে সঙ্গী হয়েছিল তাপস কাকলিও। বিরল ক্ষমতার অধিকারিনী দেখলাম আমাদের সোমা। ভোরের ঘুমটাকে মিনিট পনেরোর জন্য অরুণ আলোর দেশে পাঠিয়ে যেভাবে পুরো সূর্য ওঠার দৃশ্যটাকে যেভাবে ক্যামেরা বন্দি করে রাখলো-তাকে কুর্নিশ করতেই হয়। তারপর অবশ্য আবার ঘুমের দেশে! ইতিমধ্যে সমর আর দিবাকর পৌঁছে গেছিল গ্রামেরই এক চায়ের দোকানে, যেখানে সকালে বিকেলে আমরা হাজির হতাম কখনো লবঙ্গ চা কখনো বা আদা চায়ে চুমুক দিতে। সকাল বেলায় চায়ের দোকানটাই যে দুই বন্ধুর ফার্স্ট প্রেফারেন্স।

ত্রিবেনী সঙ্গমে ৪৫ টাকায় যে চার লুচি তরকারির ব্রেকফাস্ট দেয়, সেটা আমাদের পক্ষে এতটাই ভারী যে লাঞ্চের সময় পিছিয়ে না দিয়ে উপায় থাকে না। তৃতীয় দিন যেহেতু ১১.৩০ আমাদের ঘর ছাড়তে হবে, ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চের ঝামেলায় সেদিন আমরা যাইনি। তা বলে খালি পেটে গেঁওখালি ছেড়েছি এমনটা নয়। সকাল ১০.৩০ নাগাদ মাছ ভাতের ব্রাঞ্চে দিবাকরকে আধা খুশি করে কমপ্লেক্সের বাইরে টোটো রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই এগারোটা পার। গেঁওখালি থেকে লঞ্চে নুরপুর পৌঁছে ঘরে ফিরব এ সিদ্ধান্ত আগে হয়ে গেলেও ফেরি সার্ভিসের টাইমিংটা ঠিক জানা ছিল না। কেউ বলছে আধ ঘণ্টা আবার কেউবা বলছে এক ঘন্টা অন্তর। অথচ লঞ্চ ঘাটের কাউন্টারে গেঁওখালি থেকে নুরপুর অথবা গাদিয়ারা যাওয়ার সময় সূচী দেওয়া আছে। ঘাটের কাছে বাজারে ঘুর ঘুর করলেও এটা যে আমরা আগে দেখিনি তার মাসুল মাত্রই পঞ্চাশ মিনিট! ত্রিস্রোতার সামনে থেকে সকলের জন্য দুটো খালি টোটো যে পাবো না তা জানতাম। তবুও জনপ্রতি ১৫

টাকায় শেষ পর্যন্ত সকলেই ফেরিঘাটে পৌঁছে গেছিলাম মোটামুটি একসাথেই। সমস্যা ঐ পঞ্চাশ মিনিট -কারণ ১১.২০ র নুরপুর লঞ্চ তখন সবে ঘাট ছেড়েছে। পরের লঞ্চ যে ১২.১৫, সেটা জানা হয়ে গেল সকাল ৫.৫০ থেকে মোটামুটি ৫৫ মিনিট অন্তর বিকেল ৬.৪৫ পর্যন্ত লঞ্চের সূচী দেখে। যারা নুরপুর থেকে গেঁওখালি আসবেন, তাদের লঞ্চ ও চালু হয়ে যায় সকাল ৬.১৫ থেকে। আর চলে সন্ধ্যা ৭.১৫ পর্যন্ত মোটামুটি ঐ ৫৫ মিনিট ব্যবধানেই। ফেরিঘাটের পঞ্চাশ মিনিট কেটে গেল লাগোয়া দোকানের চা কফিতে। এরপর কাউন্টার থেকে ১০ টাকার টিকিট কাটা হয়ে গেলে সোমার ফেরিঘাটে লঞ্চ সমেত একটা ফটোসেশন শেষ হতেই আমরা নদীর বিস্তারে। মাত্রই মিনিট ১৫ – পৌঁছে গেলাম নুরপুরের লঞ্চ ঘাটে। নুরপুর থেকে নিজ নিকেতনে পৌঁছাতে উবের আমাদের একসেপ্ট না করলেও পাঁচ মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ পেরিয়ে নুরপুর বাস স্ট্যান্ডে আসতেই সমস্যার সমাধান! এসপ্ল্যানেড গামী দূরপাল্লার একদম খালি বাস আমাদের অপেক্ষায়। ৩x২ বাসে ইচ্ছে মত সিট বেছে নিয়ে কন্ডাক্টরকে জনাপ্রতি ৬০ টাকা মিটিয়ে দিতেই আমার হিসেব নিকেশ শেষ। এবার অপেক্ষা কতক্ষণে 'সরিষা' পার হয়ে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে বাস আমাদের পৌঁছে দেবে এসপ্ল্যানেডের বাস স্ট্যান্ডে। গেঁওখালির গল্প শেষে এখন যে সবার ঘরে ফেরার পালা।

মহিষাদল রাজবাড়ী

DO NOT COPY

গোপাল মন্দির

রাজপ্রাসাদের বারান্দায়

নূরপুর ফেরিঘাট

অকূল দরিয়া পানে

চিত্র-গ্রাহক – লেখক

কেমনে যাবে গণ্ডির পারে **শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালবীয়া**

খোলা জানালা দিয়ে নীল আকাশ
আমাকে ডাকে তুমি চলে এসো
আমাদের মেঘের ভেলায় চড়ে।
আঙ্গনের আম গাছে পাখিটা একা
কখন থেকে ডেকে চলেছে
এসো তুমি চলে এসো একটু সময় করে।
দূরে কোন পাহাড়ের তলায় বসে
রাখালিয়া বাজায় বাঁশি উদাস সুরে
মন চায় হারিয়ে যেতে রামধনুর ওই ছায়া ধরে।
পায়ে পায়ে যেই বেরোতে গেলাম বাইরে
দরজাটা রাস্তা রুখে গর্জে বলে ---
"কোথায় যাবে দু' পায়ে তোমার আবরুর বেড়ি পরে?
বাড়ির বধূ স্বামীর স্ত্রী সন্তানের মা
এতগুলো শিকল ছিঁড়ে কেমনে তুমি
যাবে বল গণ্ডির ও ধারে?
যেমন আছো তেমন থাকো
ওদের কথা শুনো নাকো
আজাদ ওরা বাঁধনের মায়া বুঝবে কি করে?"

DO NOT COPY

বৈপরীত্য **সুনন্দন ঘোষ**

কলকাতায় দগ্ধ হচ্ছিলাম বৈশাখের বহ্নিতে।
হঠাৎ পাওয়া একঝাঁক বন্ধুর ডাকে পা রাখলাম বার্সের জঙ্গলে,
ঘন কুয়াশা, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, তিরিতিরি ঝর্ণা, ইতিউতি রোডোডেনড্রন।
একটাই আকাশ, একটাই সূর্য,
কত বৈপরীত্য!

আমরা যখন হাঁটছি হিলে থেকে ভার্সে,
স্টুডিওর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে তখন যুদ্ধের উত্তেজনা পোহাচ্ছেন বাকজীবীরা।
সঙ্ঘাত যত বেশি দিন --- তত বেশী বাইট ---
একবিংশ শতাব্দীতে কোন যুদ্ধেই নিছক জয় বলে কিছু নেই।
কারো হাত পা কাটা যায়, কারো মাথা।
যবনিকা টানা হলে ছদ্ম নিরপেক্ষতায় কাটা ছেঁড়া ---
স্ট্র্যাটেজি, গেম প্ল্যান ---- ভুলের তালিকা তৈরি।
যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে কেমন ফিকে হয়ে যায়
বাকচতুরদের দিনগুলো।
তারা কৈফিয়ত চায় কিসের এতো তাড়া ছিল!

আর যাদের স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে রণসাজে রণাঙ্গনে,
তারা ঈশ্বরের দরজায় মাথা ঠোকে ---
অবিলম্বে বন্ধ হোক হত্যালীলা,
বিজয়ী হয়ে ফিরে আসুক ঘরের মানুষ।

একটা দেশ, একটাই মানব সমাজ, কত বৈপরীত্য!

DO NOT COPY